بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ জুন, ২০২২ মোতাবেক ০৩ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল। এ প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পর মুনাফিক ও বিরোধীদের সাথে যেসব যুদ্ধ হয়েছিল সেসবের উল্লেখ হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় মুসায়লামা কায্যাবের সাথে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)'র যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে মুসলমানদের বিভিন্ন দলের পতাকাবাহকদের বীরত্বের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আনসারদের পতাকা হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)'র কাছে ছিল আর মুহাজিরদের পতাকা ছিল হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)'র কাছে। হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) লোকজনের উদ্দেশ্যে বলেন, হে লোকসকল! অবিচলতা প্রদর্শন করো, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো আর সম্মুখে অগ্রসর হও। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ততক্ষণ কথা বলব না যতক্ষণ আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত না করেন অথবা আমি আল্লাহ্র সাথে মিলিত না হবো আর দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর সাথে কথা বলবো। এরপর তিনিও শহীদ হয়ে যান। **(আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৩২০, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সৎভাই ছিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী, অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে ইসলামগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। বদর এবং তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধে (তিনি) অংশ নিয়েছেন। হিজরতের পরে তাঁর এবং মাআন বিন আদী (রা.)'র মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন আর তাদের উভয়েই ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত খালিদ যখন সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেন তখন হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-কে একাংশের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। একইভাবে এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকাও তার হাতে ছিল। তিনি পতাকা হাতে অগ্রসর হতে থাকেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত পরম বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকেন। শাহাদতের পর (তার হাত থেকে) পতাকা পড়ে যায়। আবু হুযায়ফার মুক্তকৃত ক্রীতদাস সালেম (রা.) পতাকা তুলে নেন। এ যুদ্ধে যায়েদ (রা.) মুসায়লামার ডান হাত এবং একজন বীর অশ্বারোহী, যার নাম রাজ্জাল বিন উনফুয়া ছিল, তাকে হত্যা করেন। আর তাকে যে শহীদ করে তার নাম হলো, আবু মরিয়ম হানাফী। সে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। একবার হযরত উমর (রা.) যখন তাকে বলেন, তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছিলে তখন সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে যায়েদ (রা.)-কে সম্মানিত করেছেন। আর তার হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেন নি। অর্থাৎ, তিনি শাহাদতের মৃত্যু লাভ করেছেন আর তখন যদি তার হাতে আমি মারা যেতাম তাহলে লাঞ্ছনাজনক মৃত্যু বরণ করতাম। এখন আমি ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছি। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র

পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন হযরত উমর (রা.) নিজ শহীদ ভাইয়ের শোকে তাকে বলেন, তোমার চাচা যায়েদ যখন শহীদ হয়ে গেছেন তখন তুমি কেন ফিরে এলে? আর কেন নিজের চেহারা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখো নি। যায়েদের নিহত হওয়ার সংবাদ যখন হযরত উমর (রা.)'র কাছে পৌঁছে তখন তিনি বলেন, যায়েদ দু'টি পুণ্যের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে এগিয়ে গেছে। এর উল্লেখ পূর্বেও একবার করা হয়েছে যে, তিনি আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর আমার পূর্বে শহীদ হয়েছেন। মালেক বিন নুওয়ায়রাকে যখন হযরত খালিদ (রা.) হত্যা করেন তখন তার ভাই মুতাম্মিম বিন নুওয়ায়রা তার ভাইয়ের স্মরণে শোকগাথা পাঠ করে। নিজ ভাইয়ের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। আর প্রায়ই সে তার বিয়োগে ক্রন্দনরত থাকত এবং শোকগাথা পাঠ করত। একবার হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাতে সে নিজ ভাইয়ের শোকগাথা তাকে শোনায়। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, আমি যদি শোকগাথা রচনা করতে পারতাম তাহলে তোমার মতো আমিও আমার ভাই যায়েদ (রা.)'র জন্য শোকগাথা পাঠ করতাম। তখন মুতাম্মিম নিবেদন করেন, আমার ভাইয়ের মৃত্যু যদি সেরূপ হতো যেমন মৃত্যু আপনার ভাইয়ের হয়েছে, অর্থাৎ শাহাদতের মৃত্যু; তাহলে আমি কখনো আমার ভাইয়ের জন্য দুঃখভারাক্রান্ত হতাম না। উমর (রা.) বলেন, যেরূপ সুন্দরভাবে তুমি আমার ভাইয়ের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেছ সেরূপ আর কেউ করে নি। হযরত উমর (রা.) বলতেন, প্রভাত সমীরণ যখন বয়ে যায় তখন যায়েদের স্মৃতি সতেজ হয়ে যায়। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত আওর কারনামে, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩, পাকিস্তানের খানগড়স্থ আল্ ফুরকান ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত}, (তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮০, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত), (আল্ একতিফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১১, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৪২০ হিজরীতে প্রকাশিত)**

যাহোক, যুদ্ধের বর্ণনা চলছে। মুসায়লামা কায্যাব তখন পর্যন্ত অবিচল ছিল আর রণক্ষেত্রে (সে) কাফির বাহিনীর প্রাণকেন্দ্র ছিল। হযরত খালিদ (রা.) পর্যবেক্ষণ করেন, মুসায়লামাকে হত্যা না করা পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না। কেননা, বনু হানীফার কেউ মারা গেলে তাদের ওপর অর্থাৎ, মুসায়লামার সঙ্গীদের ওপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। তাই হযরত খালিদ (রা.) একা তাদের সামনে আসেন আর (তাদের) প্রত্যেককে একক যুদ্ধের বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানান এবং নিজেদের স্লোগান উচ্চকিত করেন। মুসলমানদের স্লোগান ছিল **'ইয়া মুহাম্মদা'**। অতএব, যে-ই মোকাবিলার জন্য এসেছে হযরত খালিদ (রা.) তাকে হত্যা করেছেন। এরপর মুসলমানরা পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত খালিদ (রা.) মুসায়লামাকে দ্বন্দযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানান। সে তা গ্রহণ করে। তখন হযরত খালিদ (রা.) তার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কিছু জিনিস উপস্থাপন করেন। অতঃপর হযরত খালিদ (রা.) তার ওপর আক্রমণ করলে সে পলায়ন করে আর তার সঙ্গীরাও পালিয়ে যায়। তখন হযরত খালিদ (রা.) মানুষকে অর্থাৎ, মুসলমানদের ডেকে বলেন; সাবধান! এখন দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না। সামনে অগ্রসর হও আর কাউকে বেঁচে ফিরতে দিও না। এতে মুসলমানরা তাদের ওপর চড়াও হয়। **(আল্ কামেল ফীত্ তারীখ লি-ইবেন আসীর, যিকরু মুসায়লামা ওয়া আহলিল ইয়ামামা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২১, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

সম্মানিত সাহাবীরা এই যুদ্ধে পরম ধৈর্য ও অবিচলতার এমন সাক্ষর রাখেন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। আর অবিরত শত্রুদের দিকে অগ্রসরমান থাকেন, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। কাফিররা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাদেরকে হত্যা করতে থাকে আর তাদের গ্রীবায় তরবারির আঘাত হানতে থাকে, এমনকি তাদেরকে একটি বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বনু হানীফার এক নেতা মুহাক্কেম বিন তোফায়েল পলায়নরত অবস্থায় মানুষজনকে বলে, হে লোকসকল! এই বাগানে প্রবেশ করো। এটি অনেক প্রশস্ত একটি বাগান ছিল যার চতুষ্পার্শ্বে দেয়াল ছিল। মুহাক্কেম বিন তোফায়েল বনু হানীফার পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলমানদের মোকাবিলা করতে আরম্ভ করে। এই বাগানটি রণক্ষেত্রের নিকটেই ছিল আর মুসায়লামার মালিকানাধীন ছিল। এই বাগানটিকে **হাদীকাতুর রহমান** বলা হতো যেভাবে মুসায়লামাকে **রহমানুল ইয়ামামা** বলা হতো। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় উক্ত বাগানে ব্যাপকহারে শত্রুদের প্রাণহানির কারণে এই বাগানকে **হাদীকাতুল মওত** অর্থাৎ, মৃত্যুর বাগান বলা হতে থাকে। মুসায়লামা কায্যাবও তার সঙ্গীদের সাথে এই বাগানে চলে যায়। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) দেখেন যে, বনু হানীফার এক সর্দার মুহাক্কেম বক্তৃতা দিচ্ছে। তিনি তার প্রতি তির নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। বনু হানীফা বাগানের ফটক বন্ধ করে দেয় আর সাহাবীরা চতুর্দিক থেকে এই বাগানটিকে অবরোধ করে ফেলেন। মুসলমানরা কোন একটি স্থানের সন্ধান করতে থাকেন যেন কোনভাবে বাগানের ভেতরে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু এটি এক দুর্গসদৃশ বাগান ছিল। সন্ধান করা সত্ত্বেও এর ভেতরে যাওয়ার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় নি। অবশেষে **হযরত বারা বিন মালেক (রা.)**, যিনি হযরত আনাস বিন মালেকের ভাই ছিলেন, তিনি উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি অনেক সাহসী ছিলেন। তিনি বলেন, হে মুসলমানরা! এখন কেবল একটি পথই খোলা আছে যে, তোমরা আমাকে তুলে বাগানের ভেতরে ফেলে দাও, আমি ভেতরে গিয়ে বাগানের ফটক খুলে দিব। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এটি অসহনীয় ছিল যে, তাদের এক উন্নত মর্যাদার সাথি হাজার হাজার শত্রুর মাঝে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবেন। তারা এরূপ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু হযরত বারা বিন মালেক (রা.) জোর দিতে থাকেন এবং বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি; তোমরা আমাকে বাগানের ভেতরে অর্থাৎ, দেয়ালের অপর দিকে ফেলে দাও। অবশেষে বাধ্য হয়ে মুসলমানরা তাকে বাগানের প্রাচীরের ওপর তুলে দেয়। প্রাচীরে উঠে হযরত বারা বিন মালিক (রা.) বিশাল শত্রুবাহিনী দেখে একমুহূর্ত থেমে পরক্ষণেই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাগানের মূল ফটকের সামনে লাফিয়ে পড়েন আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে এবং হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে ফটক অভিমুখে ধাবিত হন। অবশেষে তিনি বাগানের দরজায় পৌঁছতে সক্ষম হন এবং দরজা খুলে দেন। বাইরে মুসলমানরা দরজা খোলার-ই অপেক্ষায় ছিল। দরজা খুলতেই মুসলমানরা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে এবং শত্রুনিধন আরম্ভ করে। বনু হানীফা মুসলমানদের সামনে থেকে পালাতে থাকে কিন্তু তাদের জন্য বাগানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না, পরিণতিতে হাজার হাজার মানুষ মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, কেবল হযরত বারা বিন মালিক (রা.)ই নন বরং আরও কয়েকজন মুসলমান প্রাচীর টপকে দরজার দিকে ধাবিত হয়েছিল। ।

{মুহাম্মদ হুসেইন হায়কল রচিত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পৃ: ২০০-২০১}, (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ: ৩২১, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত), (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৫৬, দ্বারুল্ হিজর থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)

মুসলমানরা মুরতাদদের সাথে লড়াই করতে করতে মুসায়লামা কায্যাবের কাছে পৌঁছে যায়। সে প্রাচীরের এক কোটরে দাঁড়িয়ে ছিল যেন খাকি রঙের কোনো উট দাঁড়িয়ে আছে। আত্মরক্ষার জন্য সে প্রাচীরের ওপর উঠতে চাচ্ছিল এবং ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদকারী **ওয়াহ্শী বিন হারব** মুসায়লামার দিকে এগিয়ে যায় এবং ঠিক সেই বর্শা, যেটি দিয়ে তিনি হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিলেন, সেটি মুসায়লামাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন এবং সেটি তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে অপর দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর **আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা** (রা.) ত্বরিৎ মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হয়ে তার ওপর তরবারি দিয়ে আঘাত করেন ফলে সে সেখানেই কুপোকাত হয়ে যায়। দুর্গ এক মহিলা চিৎকার করে বলে, হায়! সুন্দরীদের মনিবকে এক নিগ্রো দাস হত্যা করে ফেলেছে। **(আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৩২১, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত), (আস্ সীরাতুন নবুবীয়াহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫২৮, দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

মুসায়লামা কায্যাবকে কে জাহান্নামে পাঠিয়েছে- এ বিষয়ে **বালাযারী** বর্ণনা করেন, বনু আমের গোত্রের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের গোত্রের **খিদাশ বিন বশীর** নামক এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। অপর বর্ণনায় আনসারের গোত্র খাযরাজের সদস্য **আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ** তাকে হত্যা করেন (বলে জানা যায়)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, **হযরত আবু দুজানা** (রা.) তাকে হত্যা করেছেন। **মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের** ভাষ্য অনুযায়ী তিনি নিজেই তাকে হত্যা করেন। কতকের মতে সম্ভবত সবাই তার হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাবারীসহ কতিপয় পুস্তক থেকে জানা যায়, মুসায়লামাকে এক আনসারী এবং ওয়াহ্শী যৌথভাবে হত্যা করেন। **(অধ্যাপক আলী মোহসিন সিদ্দীকি রচিত আস্ সিদ্দীক, পৃঃ ১০২-১০৩)**

ওয়াহ্শী বিন হারব মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করার ঘটনা স্বয়ং বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করার পর মানুষ যখন প্রত্যাবর্তন করে, তখন আমিও তাদের সাথে প্রত্যাবর্তন করি এবং মক্কায় অবস্থান করি। মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন এবং মক্কায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে তখন আমি তায়েফ অভিমুখে পালিয়ে যাই। লোকেরা মহানবী (সা.)-এর কাছে দূত প্রেরণ করে আর আমাকে বলা হয়, মহানবী (সা.) দূতদের বিরুদ্ধে কোন (শাস্তিমুলক) ব্যবস্থা নেন না। ওয়াহ্শী বলে আমিও তাদের সাথে যাত্রা করি আর একসময় মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যাই। মহানবী (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তুমি কি ওয়াহ্শী? আমি বলি, জ্বী হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, বসো এবং তুমি আমাকে বিস্তারিতভাবে বলো যে, হামযা (রা.)-কে তুমি কীভাবে হত্যা করেছিলে? আমি মহানবী (সা.)-কে সবিস্তারে অবহিত করি। আমার কথা শেষ হলে মহানবী (সা.) বলেন, তোমার জন্য কি সম্ভব যে, আমার সামনে আসবে না? তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে চলে যাই। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং মুসায়লামা কায্যাব বিদ্রোহ করে তখন আমি মনে মনে বলি, আমি অবশ্যই মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হব যেন এর মাধ্যমে হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। যাহোক, তিনি বলেন, এরপর আমি লোকদের সাথে উক্ত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এরপর তার অবস্থা যেমন হওয়ার ছিল হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, (আমি দেখি) এক ব্যক্তি প্রাচীরের কোটরে দাঁড়িয়ে আছে যেন গোধুম রঙের কোনো উট। তার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে আমার বর্শা নিক্ষেপ করি তথা আমি তার বুকের মাঝ বরাবর নিক্ষেপ করি ফলে সেটি তার দুই কাঁধের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মোটকথা তিনি বর্ণনা করছেন যে, এরপর আনসারদের

মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তার মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। বর্ণনাকারী **সুলায়মান বিন ইয়াসার** হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র কাছ থেকে শুনেছেন যে, যখন মুসায়লামা মারা যায় তখন সেই ঘরের ছাদে থাকা এক মেয়ে বলে ওঠে, 'আমীরুল মুমিনীন' (অর্থাৎ মুসায়লামা)-কে কৃষ্ণাঙ্গ দাস হত্যা করেছে। এটি বুখারী শরীফের বর্ণনা।

হযরত ওয়াহ্শী বলেন, আমাদের মাঝে (অর্থাৎ, আমি ও সেই আনসারী সাহাবীর মাঝে) কে মুসায়লামাকে হত্যা করেছে তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিন্তু যদি আমিই হত্যা করে থাকি তাহলে মহানবীর (সা.)-এর পর সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ, হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার অপরাধও আমিই করেছিলাম আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও আমিই হত্যা করেছি। **(আস্ সীরাতুন নবুবীয়াহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫২৮, তাহরিয হিনদ ওয়ান্ নিসওয়াতি মাআহা, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত) (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কাতলু হামযাতাবনি আব্দিল মুত্তালিব, রেওয়ায়েত নাম্বার: ৪০৭২)**

সহীহ্ বুখারীর বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) ওয়াহ্শীকে যে বলেছিলেন, **'তোমার জন্য কি আমার সামনে না আসা সম্ভব?'** এর ব্যাখ্যায় হযরত **সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্** সাহেব লিখেন, ওয়াহ্শী (রা.)'র মাঝে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছিল তা তার নিষ্ঠার প্রমাণ বহন করে। তিনি কোনো না কোন ভাবে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করছিলেন। অতএব, ইয়ামামার ভয়ানক যুদ্ধে নিজের এই ইচ্ছা এবং মনোবাসনা পূর্ণ করে তিনি ধন্য হয়েছেন। শাহ্ সাহেব লিখেন, মহানবী (সা.) এর এই বাক্য-

فهل تستطيع ان تغيب وجهک عنی

(উচ্চারণ: ফাহাল তাসতাতীউ আন তুগাইয়্যেবা ওয়াজহাকা আন্নী)

অর্থাৎ, তোমার জন্য কি এটি সম্ভব যে, তুমি আমার সামনে আসবে না?

এই শব্দমালা এক অতীব মহান চরিত্রের পরিচায়ক। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) ওয়াহ্শীকে তাঁর বাসনার কথা বলেছেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার সামনে এসো না। এই বাচনভঙ্গী আদেশসূচক ছিল না বরং এটি ছিল অনুরোধসূচক এবং এর মাধ্যমে হযরত হামযা (রা.)'র প্রতি মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের সেই গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। একজন প্রতিশোধ প্রবণ প্রতিশোধ নিয়ে হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারতো। কিন্তু মহানবী (সা.) এক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ আচরণ করেছেন। কেবলমাত্র এটুকু চেয়েছেন যে, সে যেন তাঁর সামনে না আসে। যেন হযরত হামযা (রা.)'র মর্মস্পর্শী শাহাদতের কথা স্মরণে তিনি মর্মযাতনায় না ভোগেন। **(যয়নুল আবেদীন সাহেব অনূদিত সহীহ্ বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮-১৯৯)**

ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা অন্য এক জায়গায়ও বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের সাহসিকতা ও বীরত্বের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, দু'দলের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয় যার ফলে দু'দলেরই অনেক মানুষ নিহত ও আহত হয়। মুসলমানদের মাঝে সর্বপ্রথম **মালিক বিন অওস** শহীদ হন। মুসলমানদের অনেক কুরআনের হাফিয শাহাদত বরণ করেন। দু'দলের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এমনকি মুসলমান দল মুসায়লামার বাহিনীর মাঝে এবং মুসায়লামার বাহিনী মুসলমান দলের মুখোমুখি হয়। যখন মুসলমানরা পিছু হটতো তখন শত্রুপক্ষ সামনে অগ্রসর হত যাতে মুজাআ' পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আবু হুযাইফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম নিজ পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত গর্ত খনন করেন। তার কাছে ছিল মুহাজিরদের পতাকা আর সাবেত (রা.)ও নিজের জন্য একই ধরনের গর্ত খনন করেন। এরপর তারা উভয়েই তাদের পতাকা নিজেদের শরীরের সাথে আঁকড়ে ধরেন। মানুষ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ, গর্ত খনন করে তার মাঝে

তারা দাঁড়িয়ে যান এবং পতাকা আঁকড়ে ধরে রাখেন। এভাবে সালেম (রা.) এবং সাবেত (রা.) পতাকা হাতে অবিচল থাকেন। একপর্যায়ে সালেম এবং আবু হুযায়ফা (রা.) শাহাদত বরণ করেন। হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)'র মস্তক সালেমের পায়ের কাছে পড়ে ছিল এবং সালেম (রা.)'র মস্তক আবু হুযায়ফার পায়ের কাছে পড়ে ছিল। সালেম (রা.) শহীদ হওয়ার পর পতাকা সেখানে কিছুক্ষণ পড়ে থাকে, কেউ সেটি তুলে নি। এরপর বদরী সাহাবী **ইয়াযীদ বিন কায়েস** (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে উক্ত পতাকা হাতে তুলে নেন। এরপর তিনিও শাহাদত বরণ করেন। এরপর **হাকাম বিন সাঈদ বিন আস (রা.)** উক্ত পতাকা হাতে তুলে নেন এবং এর সুরক্ষায় পুরো দিন যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। ওয়াহ্শী বলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। তিনবার মুসলমানদের অবস্থা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থবার মুসলমানরা পাল্টা আক্রমণ করে আর এই বার তাদের নিজেদের অবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে যায় আর তারা তরবারির তীব্র আক্রমণের মুখেও অটল অবিচল থাকেন। বনু হানীফা ও মুসলমানদের তরবারি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এমনকি আমি তা হতে আগুনের ফুলকি বের হতে দেখেছি। আর আমরা ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় তরবারির শব্দ শুনি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি স্বীয় সাহায্য অবতীর্ণ করেন আর বনু হানীফাকে আল্লাহ্ তা'লা পরাজিত করেন এবং মুসায়লামাকে তিনি হত্যা করেন। তিনি বলেন, আমি সেদিন ব্যাপকহারে আমার তরবারি চালাই এমনকি আমার হাতে সেই তরবারির হাতল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি **হযরত আম্মার** (রা.)-কে দেখি তিনি একটি পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে বলছিলেন, **হে মুসলমানদের দল! তোমরা কি জান্নাত থেকে পলায়ন করছ? আমি আম্মার বিন ইয়াসের, আমার কাছে আসো।** বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখছিলাম; তার কান কেটে ঝুলছিল। **আবু খায়সামা নাজ্জারী** বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আমি একদিকে চলে যাই এবং আমার চোখের সামনে এ দৃশ্য ছিল, অর্থাৎ আমি সেদিন হযরত আবু দুজানাকে দেখছিলাম, তার নাম ছিল **সিমাক বিন খারাশাহ্** কিন্তু আবু দুজানা ডাকনামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইনি সেই বিখ্যাত সাহাবী যিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) একটি তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে এটির যথোপযুক্ত ব্যবহার করবে? তখন আবু দুজানা বলেন, আমি করব। মহানবী (সা.) তাকে সেই তরবারিটি দান করেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এর উপযুক্ত ব্যবহার কি? তিনি (সা.) বলেন, **মুসলমানদের হত্যা করবে না এবং কাফিরদের ভয়ে পালাবে না।** হযরত আবু দুজানা (রা.) যথারীতি মাথায় লাল পট্টি বাঁধেন এবং দম্ভভরে বীরদর্পে এগিয়ে সারির মাঝে এসে দাঁড়ান। মহানবী (সা.) বলেন, যদিও এভাবে হাঁটা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কোন সমস্যা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পরম বীরত্বের সাথে মোকাবিলা (বা লড়াই) করেন এবং অনেক কাফিরকে হত্যা করেন এবং মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় অনেক আঘাত বরণ করেন কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছপা হননি।

পেছনের এটি মহানবী (সা.)-এর যুগের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। যাহোক, ইয়ামামার যুদ্ধের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, এসময় আবু দুজানার ওপর বনু হানীফার একটি দল আক্রমণ করে। এখন, ইয়ামামায় কি হয়েছিল? তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে যে, তাঁর (অর্থাৎ আবু দুজানার) ওপর একটি দল আক্রমণ করে। তখন তিনি তাঁর সম্মুখেও তরবারি চালান, তাঁর ডানেও তরবারি চালান এবং বামেও তরবারি পরিচালনা করেন। তিনি একজনের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে ভূপাতিত

করেন। তিনি কোন কথা বলছিলেন না। এমতাবস্থায় সেই দলটি তার থেকে দূরে সরে যায় এবং ফেরত চলে যায় আর মুসলমানরা কাছে চলে আসে। বনু হানীফা পরাজিত হয়ে বাগান অভিমুখে পলায়ন করে, মুসলমানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাদেরকে বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। তারা বাগানের দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন আবু দুজানা বলেন, আমাকে ঢালের ওপর বসিয়ে (বাগানের মধ্যে) ফেলে দাও যাতে আমি ভেতরে গিয়ে বাগানের দরজা খুলে দিতে পারি। অতএব, মুসলমানরা এমনটিই করেন এবং তিনি বাগানের (ভেতরে) পৌঁছে যান। তিনি (রা.) বলছিলেন, তোমাদের পলায়ন আমাদের হাত থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। তিনি তাদের সাথে তুমুল লড়াই করেন আর এক পর্যায়ে (বাগানের) দরজা খুলে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বাগানে প্রবেশ করে তার কাছে পৌঁছার পূর্বেই তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে বারা' বিন মালেককে বাগানের (ভেতরে) নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু এটির চেয়ে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক বলে মনে নয়। **(আল্ একতিফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৪২০ হিজরীতে প্রকাশিত), (সহীহ্ মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলুস্ সাহাবা, বাব মান ফাযায়েলু আবী দুজানা... হাদীস নং: ৬৩৫৩), (কনযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯, হাদীস নং: ১০৭৯২, বৈরুতের মুসাস্‌সাতুর্ রিসালাহ্ থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত)**

এর বিশদ বিবরণও রয়েছে। যাহোক, বাকী ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি পাকিস্তানের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করতে চাচ্ছি। আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। পাকিস্তানের সামগ্রীক অবস্থাই অবনতির দিকে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় আহমদীদের প্রতিও তাদের কুদৃষ্টি পড়ে। বিরোধিতা বাড়ছে। পুরনো কবর উপড়ে ফেলা হতেও তারা বিরত হয়নি। **এরা চরম নোংরা প্রকৃতির মানুষ। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে পাকড়াও করুন।** অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, তারাও বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আফগানিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি স্বীয় আশিস বর্ষণ করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই, নামাযান্তে তাদের (গায়েবানা) জানাযার নামাযও পড়াবো। এদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, **জামাতের মুবাল্লিগ মোকাররম নাসীম মাহদী সাহেবের,** যিনি মোকাররম মওলানা আহমদ খান নাসীম সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একজন মূসী (তথা ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। তিনি দু'টি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং উভয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে দু'জন করে পুত্র সন্তান ও একজন করে কন্যা রেখে গেছেন। তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে ১৯৭৬ সালে পাশ করেছিলেন, এরপর তিনি **এসলাহ্ ও এরশাদ মোকামী**'তে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তাকে মুবাল্লিগ হিসেবে সুইজারল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে তিনি সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে তাকে **নায়েব ওকীলুত তবশীর** নিযুক্ত করা হয়। কয়েকমাস তিনি ভারপ্রাপ্ত **ওকীলুত তবশীর** হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এখানে লণ্ডনে এসেছিলেন, এখানে প্রাইভেট সেক্রেটারী লণ্ডন হিসেবেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। এর কয়েকমাস পর ১৯৮৫ সালে তিনি লণ্ডন থেকেই কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা

করেন। ১৯৮৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি কানাডার মুবাল্লিগ হিসেবে এবং এরপর **কানাডার মুবাল্লিগ ইনচার্জ** হিসেবে (দায়িত্বপালনের) সৌভাগ্য লাভ করেন। এসময়ে তিনি **কানাডার আমীর**ও ছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি **আমেরিকার মুবাল্লিগ ইনচার্জ** হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন, এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পুনরায় সুইজারল্যাণ্ডে তার পদায়ন হয়, কিন্তু তিনি লিখেন; **"আমার ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তার বলেছেন, এই অবস্থায় আমি ভারী কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবো না"**। তাই তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি নিয়ে নেন। যাহোক, তাকে আমি লিখেছিলাম, ডাক্তার যদি এমন কথা বলে থাকেন তাহলে স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখুন। আরোগ্য লাভ করলে জানাবেন, তাহলে পুনরায় আপনার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ্, কিন্তু তার অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যেমনটি আমি বলেছি, ১৯৮৫ সালে তিনি কানাডা গিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে **'বায়তুল ইসলাম'** মিশন হাউজের জন্য ২৪ একর জমি ক্রয় করা হয়, এরপর সেটিকে আবাদও করা হয়। তার সময় অনেক আহমদী কানাডায় এসে বসতি স্থাপন করেন, আর তিনি তাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন। অধিকাংশ মানুষ অনুগ্রহের কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি চাঁদা ও তাজনীদের সিস্টেম বা ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজ্ড করিয়েছেন। (তার সময়ে) **টরোন্টো ও ক্যালগারী'**তে দু'টি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য জামা'তে কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ভ্যানকুভারের মসজিদটিও সম্ভবত তার আমলেই নির্মিত হয়েছিল। যাহোক, এই দু'টি বিশাল মসজিদ তো আছেই। ২০০৩ সালে তার সময়েই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় **জামেয়া আহমদীয়া কানাডা** প্রতিষ্ঠিত হয়। **এমটিএ নর্থ আমেরিকা স্টেশন** স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার এসব সেবা গ্রহণ করুন।

তার স্ত্রী আমাতুন্ নাসীর সাহেবা লিখেছেন, **"২৬ বছরের দাম্পত্য জীবনে আমার সকল দুঃখ-কষ্টে নাসীম মাহদী সাহেবকে আমার পাশে পেয়েছি, তিনি অনেক ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনকারী একজন স্বামী ছিলেন। একজন স্নেহবৎসল পিতা ও নিঃস্বার্থ ভাই ছিলেন। (তিনি) অত্যন্ত মানবদরদী ছিলেন এবং খিলাফতের একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরম আস্থাশীল (একজন) পুণ্যবান মানুষ ছিলেন।"** এরপর তার স্ত্রী তার সম্পর্কে আবারও একথাই লিখেছেন, "তিনি মানুষের নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন। মানুষের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। জামাতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতেন না আর তার সামনে (জামাতের বিরুদ্ধে) কারও কথা বলার দুঃসাহসও হতো না, (বা তিনি) করতে দিতেন না। তিনি অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ ছিলেন। দরূদ শরীফ পড়ার প্রতি গভীর মনোযোগ ছিল। তার স্ত্রী বলেন, আমরা যখন উমরা করতে যাই তখন আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করি, কী দোয়া করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি তো সেখানে কেবল দরূদ শরীফ পাঠ করেছি।

তার কন্যা সাদীয়া মাহদী বলেন, আমার পিতা অনেক দোয়া করতেন। আমি কখনো দোয়া করতে বললে তিনি বলতেন, দরূদ শরীফ পড়তে থাক। যখনই কোন বিষয়ে দোয়া করতে বলতাম সব সময়ই তিনি দরূদ শরীফ পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি সব বিষয়েই শুধু দরূদ শরীফ পড়তে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, দরূদ শরীফ পড়। আর বুঝাতেন, দরূদ শরীফই সবচেয়ে বড় দোয়া; এটি কবুল হলে সব দোয়া গৃহীত হবে।

এরপর ইসমত শরীফ সাহেবা বলেন, মাহদী সাহেব আমার ভগ্নিপতি ছিলেন। তাকে আমি বাইশ বছর খুব কাছে থেকে দেখেছি, তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম যত্নবান, খুবই স্নেহশীল এবং যুগ-খলীফার প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বস্ত একজন মানুষ ছিলেন।

তার বোন বলেন, তিনি যখন সুইজারল্যাণ্ডে জামা'তের মুরব্বী ছিলেন তখন একজন সুইচ মেয়ে বয়আ'ত করেছিল। সে সালানা জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়াতে আসে এবং আমাদের রাবওয়ার বাড়িতে আসে আর বলে, আমি নাসীম মাহদী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমার সেই মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা যার পুত্র এমন মেধাবী, যিনি এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ভাষা রপ্ত করেছেন। কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই তিনি তবলীগের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন আর প্রতিটি বিষয়েই তিনি সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন।

তার পুত্রবধূ বলেন, তিনি আমাদেরকে সব সময়ই দরূদ পাঠের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে কৃত দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে বলতেন। তিনি বলেন, একবার এয়ারপোর্টে লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় খতিয়ে দেখি যে, পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে (তিনি) দরূদ শরীফ পড়তে শুরু করেন এবং সেভাবেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কাউন্টারে কর্তব্যরত লোকটি পাসপোর্ট দেখেও নি আর এভাবেই তাকে পার করে দেয়।

তার জামাতা লিখেন, আমার বিয়ে হওয়ার পর থেকেই অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। নিজের হাতে চা বানিয়ে দিতেন। ফজরের নামাযের পর আমার সাথে বসে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বা ঘটনা শোনানোর পর সেটির তফসীর শোনাতেন আর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আমাদের তরবীয়ত করতেন।

তার কন্যা নাওয়াল মাহদী বলেন, আমি সব সময়ই দেখেছি পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। (তিনি) পবিত্র কুরআনের সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। এছাড়া আমাদেরকেও বলতেন, গভীর মনোযোগের সাথে পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করো এবং এর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করো, এর ফলে তুমি আল্লাহ্ তা'লার কুদরতের লীলা প্রত্যক্ষ করবে আর পবিত্র কুরআন পাঠের স্বাদ পেতে আরম্ভ করবে। আরও বলেন, তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, (তার নামাযের) কিয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ হতো এবং তার নামায কাকুতিমিনতিতে পূর্ণ থাকত। পবিত্র রমযানে তিনি পবিত্র কুরআনের দরস দেয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে দরস প্রস্তুত করতেন। অন্য লোকেরাও (এ বিষয়টি) লিখেছেন। পবিত্র কুরআনের কঠিন শব্দগুলোর অর্থ এবং তাৎপর্য বর্ণনা করতেন আর এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দগুলো উল্লেখ করতেন, ফলে মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারত।

কানাডার আমীর লাল খান সাহেব বলেন, কানাডার সাবেক আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জের সাথে আমি ১৯৮৭ সাল থেকে আরম্ভ করে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক গুণে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আর সেসব গুণ তিনি জামা'তের সেবায় ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বন্ধু বানানো, বন্ধুত্ব রক্ষা করা এবং এসব সম্পর্ক ও পরিচিতিকে জামা'তের স্বার্থে ব্যবহার করার সৌভাগ্য দান করেছেন। কানাডিয়ান সমাজের অগণিত বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং জামা'তের সাথে তাদেরকে পরিচিত করান। মাশাআল্লাহ্ এই দক্ষতাও তার মাঝে খুব ভালোভাবে ছিল। যাদের সাথেই তিনি সম্পর্ক গড়তেন তা খুবই ভালো ও গভীর সম্পর্ক হতো আর অন্যরাও এ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। এভাবে তার মৃত্যুতে অ-আহমদীরাও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। লাল খান সাহেব লিখেন, পাকিস্তান

এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত সদস্যবৃন্দ ও পরিবারগুলোকে দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং সাহায্য করার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্যও আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেছেন। তিনি আরও বলেন, মজলিসে আমেলার সদস্যদের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, তার আমীর থাকাকালীন আমি প্রায় বিশ বছর (জামাতের) সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছি। এ সময়ে তিনি আমাকে কখনো এটি অনুভব করতে দেন নি যে, তিনি আমীর হবার কারণে আমি তার অধীনস্ত, বরং তিনি আমার সাথে একজন বন্ধুর ন্যায় আচরণ করেছেন।

ডাঃ আসলাম দাউদ সাহেব বলেন, নাসীম মাহদী সাহেবকে ২০০৯ সালে **অর্ডার অব অন্টারিও** সম্মাননায় ভূষিত করা হয় যা সেই প্রদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা– যাতে কোন নাগরিক ভূষিত হতে পারে। এই সম্মাননা যেকোন ক্ষেত্রে সফলতা এবং সর্বোচ্চ সেবার কারণে প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, আমেরিকায় তার পদায়নের পর একবার জলসা সালানায় তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, বর্তমানে তুমি যে অবস্থানে আছো সেই অবস্থানে থেকে যত বেশি মানুষের সেবা করা সম্ভব তা করো। যখনই তোমার কাছে জামা'তের কোন সদস্য আসবে তাকে সাহায্য করো এবং কখনো তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিবে না। তাদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব করো। আর একথাও বলেন যে, অনেক সময় মানুষ খোলাখুলি কথা বলে না; এ অবস্থায় গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে তাদের সাহায্য করা উচিত। তিনি বলেন, আমি সবসময় তাকে অভাবীদের সাহায্য করতে দেখেছি এবং সর্বদাই তিনি এমনভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে সাহায্য করতেন যেন অভাবীরা কোনভাবেই লজ্জিত না হয়।

মুরব্বী সিলসিলাহ্ শাকুর সাহেব বলেন, তার অনেকগুলো কথার মাঝে একটি উপদেশ আমার মাথায় গেঁথে রয়েছে আর তা হলো, জামেয়ার প্রারম্ভিক বছরগুলোর কথা, সম্ভবত তখন আমি দরজায়ে সানীয়াতে ছিলাম। একদিন আসরের নামাযের সময় আমি চটিজুতা পরে মসজিদে চলে আসি। তখন তিনি আমাকে বলেন, জামা'তের ওয়াকেফীনদের সবসময় যেকোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া উচিত যাতে কোন নির্দেশ পেলে সেখান থেকেই তৎক্ষণাৎ তা পালনের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়ে চলে যেতে পার। এমন যেন না হয় যে, তুমি বলবে– **'আমি বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে আসছি।'** মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি দৈহিকভাবেও সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত।

অনুরূপভাবে আমেরিকার মুরব্বী সিলসিলাহ্ ফারাসাত ওমর সাহেব বলেন, আমার যখন জামেয়ার ইন্টারভিউ হয় তখন মাহদী সাহেব একটি প্রশ্ন করেন আর তা হলো, তোমাকে যদি মুবাল্লিগ হিসেবে আফ্রিকায় পাঠানো হয় এবং স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে সেখানে বিরোধিতা দেখা দেয় তাহলে তুমি প্রথমে কার সাথে যোগাযোগ করবে? তোমার মায়ের সাথে নাকি খলীফাতুল মসীহ্র সাথে? তিনি বলেন, আমি চিন্তাভাবনা করে উত্তর দেই, খলীফাতুল মসীহ্র সাথে। তখন মাহদী সাহেব বলেন, এ উত্তরের ভিত্তিতেই আমি তোমাকে ভর্তি করে নেয়ার জন্য সুপারিশ করছি কেননা, এটিই সঠিক উত্তর।

মিশন হাউজের সেক্রেটারী কর্ণেল দিলদার সাহেব বলেন, নাসিম মাহদী সাহেবের মাঝে খলীফাদের আনুগত্যের স্পৃহা লক্ষ্যণীয়ভাবে পরিলক্ষিত হতো। তার বিভিন্ন অবদানের মধ্যে পিস ভিলেজ প্রতিষ্ঠা হলো অন্যতম। যেভাবে এটি গড়ে উঠে তা হলো, যেযুগে কানাডার বার্ষিক জলসা বায়তুল ইসলাম মসজিদ সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হতো তখন এর পাশের কৃষি জমির মহিলা মালিক প্রতি বছর জলসার সময় অভিযোগ করতো যে, এদের জলসার শোরগোলের কারণে আমি

আতঙ্কিত থাকি এবং তাদের অতিথিশালার খাবারের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। যাহোক, কিছুদিন পর যখন সরকার সেই কৃষি জমির নতুন (Zoning) বা অঞ্চলায়ন করে তখন এটিকে আবাদি জমি থেকে আবাসিক অঞ্চলে পরিবর্তন করে দেয় তখন নাসীম মাহদী সাহেব এ মর্মে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে, (অদ্যবধি) একজন মহিলা মালিক আমাদেরকে বিরক্ত করতো এখন তো অনেক বাড়ির মালিক এসে যাবে সেক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিবে। এ প্রেক্ষিতে তিনি ঈদের দিন জামাতের সদস্যদের সামনে একটি স্কীম উপস্থাপন করে বলেন, আমরা সব আহমদীরাই এখানে বাড়িঘর বানিয়ে নেই না কেন! (চলুন) আহমদীরাই এই জায়গা কিনে নেই। অতএব, জামাতের সদস্যরা এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় পরবর্তীতে পীস ভিলেজ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ যীশান গোরাইয়া সাহেব বলেন, তার মাধ্যমে অগণীত যুবক তরবীয়ত বা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছে এবং তার এই তরবীয়তের কল্যাণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ হিসাবে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছি। তার তরবীয়তের কল্যাণে আমরা খিলাফতকে ভালোবাসতে শিখেছি এবং আনুগত্যের প্রকৃত প্রেরণা নিজেদের মাঝে বৃদ্ধি পেতে দেখেছি।

অনুরূপভাবে কানাডার সেক্রেটারী উমুরে খারেজা আসেফ খান সাহেব বলেন, আমি তেরো বছর বয়সে ভন (Vaughan)-এ এসেছিলাম। তখন মিশন হাউজের আশেপাশে আনুমানিক কয়েক ডজন আহমদী ছিল। সেসময় আমার জামাতী জ্ঞান খুবই সামান্য ছিল। সেসময় নাসীম মাহদী সাহেব আমার সাথে নিজের ছেলের মত ব্যবহার করেন, আমার শিক্ষক হয়ে যান। বাস্কেটবল খেলতেন আর আমাদেরকে জামা'তী তথা ধর্মীয় জ্ঞান শিখাতেন। আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে তিনি আমাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করার জন্য জামা'তীভাবে দায়িত্ব দিতেন আর একইভাবে তিনি আজও আল্লাহ্‌র কৃপায় খুবই ভালো কাজ করছেন। তিনি বলেন, আমি সবকিছু তার কাছ থেকেই শিখেছি।

আমেরিকা জামাতের আমীর মির্যা মাগফুর আহমদ সাহেব বলেন, ২০১৬ সনে আমেরিকা জামাতের মিশনারী ইনচার্জ এবং নায়েব আমীর হিসাবে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি আমেরিকায় অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং অনেক সফরও করেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে সফরে গিয়েছেন, তবলীগের কাজকে কার্যকরীভাবে আরম্ভ করার চেষ্টা করেছেন। মরহুম সেসময় মিডিয়া এবং বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী আমেরিকায় প্রচার ও প্রসারের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া মেক্সিকোতে জামা'ত প্রতিষ্ঠাকল্পে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে সেখানে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল।

আমেরিকার সেক্রেটারী তবলীগ ওয়াসীম সৈয়্যদ সাহেব বলেন, সবার সাথে তিনি হৃদ্যতা ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন আর সম্পর্ক স্থাপনের সূচনা তার পক্ষ থেকেই হতো। আর ইসলামের সেবায় সবাইকে কাজে লাগানোর পন্থা জানতেন। তিনি আমেরিকায় আসার পর প্রতি বছর **১১ই** সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের একটি কার্যকর মাধ্যম বানান এবং **মুসলিম ফর লাইফ** এবং **মুহাম্মদ মেসেঞ্জার অব পীস** শিরোনামে মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমেরিকার ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এসব বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মাঝে ব্যাপকহারে **লাইফ অফ মুহাম্মদ**

পুস্তকটি উপহারস্বরূপ দেয়া হয়। **মুসলিম ফর লয়্যালটি**'র আয়োজনও তিনি আরম্ভ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় প্রশাসনিক মহলের সাথে সভা-সমাবেশ করেন এবং ইসলামী শিক্ষাকে তাদের সামনে সমুন্নত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একবার এক সালানা জলসায় তাঁর বক্তৃতায় সুইজারল্যাণ্ড জামাতের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে জামাতের পরিচিতিমূলক ফোল্ডার বিতরণ স্কীমে নাসীম মাহদী সাহেবের কর্মতৎপরতার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, **'সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ের ওপর গবাদি পশু পালনকারী তিনটি গোত্র বসবাস করে। তিনটির ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন। সংখ্যায় আটাশ হাজার। সংখ্যা এর চেয়েও কম। যাহোক, তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে আটাশ হাজার সংখ্যায় যারা রয়েছে তাদের ভাষায় ফোল্ডার ছাপিয়ে ফেলেন নাসীম মাহদী সাহেব, (আল্লাহ্ তা'লা তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন), আমার সাথে পরামর্শ করার পর আট হাজার ফোল্ডার সেখানকার বাড়িঘরে পৌঁছে দেন। সেখানকার প্রতিটি বাড়িতে তা পৌঁছার পর হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যায়। দু'টি সংবাদপত্র কঠিন সমালোচনামূলক সংবাদ প্রকাশ করে।** (সাবীলুর রিশাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৬-৪২৭)

আমি বললাম, খুব ভালো হয়েছে। তার অনুকূলে ভালো দোয়া হয়ে গিয়েছে। কয়েক লক্ষ ফোল্ডার বিতরণ হয়েছে। {খুতবাতে নাসের (রাহে.), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩-৫৪৪}

যাহোক, এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সেখানে জলসায় উপস্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজের প্রিয়দের চরণতলে তাকে ঠাঁই দিন। তার স্ত্রী-সন্তানদেরও ধৈর্য এবং দৃঢ়মনোবল দান করুন এবং (তাদেরকে) তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সামর্থ্য দান করুন। তিনি যেভাবে বিশ্বস্ততার সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন তার সন্তানরাও যেন একইভাবে বিশ্বস্ততার সাথে জীবন কাটাতে পারে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ রাবওয়ার স্নেহের মুহাম্মদ আহমদ শারেম-এর। এই কিশোর ষোলো বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুসারে মৃত্যুবরণ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। খিলাফতের প্রতি উৎসর্গীত, হাস্যবদন এবং সবার প্রিয়ভাজন এক কিশোর ছিল। আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী ছিল। জামা'তের এবং অঙ্গসংগঠনের অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সে মূসী ছিল, এই বয়সেই সে ওসীয়্যত করেছিল। শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা ছাড়া দুই বোন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো, মরহুম রশীদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী সেলীমা ক্বমর সাহেবার যিনি গত ১৬ই মে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছিল তার পিতা চৌধুরী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের নানা ম্যাকিরিয়া'র হযরত মৌলভী উযীরউদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন এবং কাঙড়ায় হেডমাস্টার ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব–মৌলভী ফাযেল পাশ ছিলেন এবং জামা'তের একজন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এক দীর্ঘ সময় তিনি খিলাফত লাইব্রেরীর ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি সদর উমূমী রাবওয়া হিসেবেও দীর্ঘদিন সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মৌলভী সাহেব অর্থাৎ, সেলীমা ক্বমর সাহেবার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র নির্দেশ অনুসারে রাবওয়া প্রতিষ্ঠাকালে

তাঁবু খাটানো এবং প্রথম রাত রাবওয়ায় অবস্থানের সম্মান লাভ করেছিলেন। মরহুমা রাবওয়াতেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে আরবীতে এম, এ ডিগ্রী অর্জন করেন। (তিনি) দীর্ঘকাল বিভিন্ন বিভাগে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭২-৮২ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮২-৮৭ সাল পর্যন্ত আমাতুল হাঈ লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ান হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৭-২০১৮ সাল পর্যন্ত ৩১ বছর 'মিসবাহ্' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময়কালে তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও 'মিসবাহ' পত্রিকা অনেক সুন্দরভাবে চালিয়েছেন। মরহুমা অত্যন্ত পুণ্যবতী স্বভাবের, ইবাদতগুযার, দোয়াগো এবং সরল প্রকৃতির অধিকারিণী ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাযের পাশাপাশি অন্যান্য নফল নামায যেমন, চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামাযও নিয়মিত আদায় করতেন। খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দোয়ার দিকটি স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠতো। একজন ফিরিশ্‌তা স্বভাবের মহিলা ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা ও মমতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কখনো কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪শে জুন, ২০২২, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)